Bhatter College Journal of Multidisciplinary Studies | ISSN 2249-3301, Vol. VII, Number 2, 2017
A Refereed Journal, approved by the UGC & included in Google Scholar
Article url: www.bcjms.bhattercollege.ac.in/v7/n2/v7n2bnl02.pdf
Article DOI: 10.25274/bcjms.v7n2.v7n2bnl02

ইন্দ্রিয়সংযমের শিক্ষা ও রামায়ণঃ একটি আলোচনা

শিশির কুমার ঢালী

সহশিক্ষক, গয়েশ্বরী প্যারী ভুবন বিদ্যানিকেতন, Email: dhali.sisirkumar99@gmail.com

সংক্ষিপ্তসার (Abstract):

মনুষ্যদেহে বসবাসকারী ষড়রিপুর অন্যতম কাম। ভগবান তাঁর সৃষ্টিকে পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপভোগ করবার জন্যই মনুষ্য প্রজাতির সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং, পৃথিবীতে সৃষ্টি বজায় রাখতে গেলে নিঃসন্দেহে কামের প্রয়োজন আছে। যেহেতু কামাদি রিপুগুলি সহজাত, তাই এগুলির সমূলে বিনাশ সম্ভব নয় এবং তা কাম্যও নয়; এর দমন সম্ভব এবং তা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু কাম-প্রবৃত্তি অসংযতভাবে বৃদ্ধি পেলে সমাজে নারীজাতি অনেক ক্ষেত্রেই তার শিকার হয়ে থাকে। শুধু তাই নয়, অসংযত মন ও ইন্দ্রিয়ের বশীভূত ব্যক্তি নিজকৃত কর্মের পরিণাম সম্পর্কে সচেতন থাকতে পারে না। অপিচ কাম-কামনা ঋদ্ধিমান পুরুষের শুভবোধকে পর্যন্ত হরণ করে থাকে। কামের এই সর্বগ্রাসী প্রবৃত্তির অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ পুত্রপ্রীতি, ভ্রাতৃপ্রীতি, পত্নীপ্রীতি ও বন্ধুতা থেকে শত্রুতায় পরিণত করে। তাই আদিকবি বাল্মীকি তাঁর আর্য রামায়ণে বিবিধ চরিত্র ও ঘটনাবলীর অনুসঙ্গে সমাজকে ইন্দ্রিয়াসক্তির বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে সমুচিত শিক্ষা দিতে এই কালজয়ী আখ্যান রচনা করেছিলেন।

সূচকশব্দ (Keywords): রামায়ণ, বাল্মীকি, ষট্‌রিপু, কামনিন্দা, ইন্দ্রিয়সংযম

সংস্কৃতে রচিত রামায়ণ মহাকাব্য বিশ্বের সর্বযুগের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ রচনার অন্তর্ভুক্ত। হোমার রচিত ইলিয়ড ও অডীসী যেমন গ্রীক সাহিত্যের আদর্শ প্রতীক, তেমনি বাল্মীকি রচিত আর্য রামায়ণ সমগ্র ভারত চেতনার স্থানকালাতীত প্রতিভূরূপে গৃহিত হতে পারে।[১] সুদূর প্রাচীনকাল (আর্য সভ্যতা) থেকে শুরু করে আজও ভারতে ও বহির্ভারতে (বিশেষ করে পূর্ব এশিয়ায়) অগণিত সম্প্রদায় তাদের আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক ও দর্শন চিন্তার মৌল প্রেরণা হিসাবে রামায়ণের জনপ্রিয় কাহিনীকে গ্রহণ করে এসেছে। ইতঃপূর্বে ধার্মিক বা আধ্যাত্মিক গ্রন্থরূপে বেদ চর্চিত হয়ে থাকলেও সকলশ্রেণির মানুষের কাছে তার প্রভাব সর্বব্যাপী হয়নি; কেননা, এমন ব্যক্তি খুব কমই আছেন যারা বেদ পাঠ করেন আর যারাই-বা এই দুর্বোধ্য দার্শনিক গ্রন্থের মুখোমুখি হয়েছেন, তাদের মধ্য স্বল্প পাঠক রয়েছেন যারা সম্পূর্ণ বেদ পাঠ করেছেন। স্বাভাবিকভাবেই, মানুষের সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক জগৎ একপ্রকার শূন্যই থেকে গেছে। এই শূন্যতা পূরণার্থে বিবিধ সম্প্রদায় রামায়ণের কালজয়ী জনপ্রিয় কাহিনিকে বেছে নিয়েছে। কেবল আধ্যাত্মিক বা ধর্মীয় আবেদন নয়, সমকালীন সময়ে এই সকল গ্রন্থগুলির মাধ্যমে গ্রন্থকারিকেরা সমাজশিক্ষা ও নীতি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকতেন। রামায়ণে এমন দেদার নীতিশিক্ষার কথা আছে, যে- কেউ এই বহু আলোচিত গ্রন্থের সম্মুখিন হলেই তা উপলব্ধি করতে পারবে।

রামায়ণ প্রকৃত অর্থেই একটি আদর্শকাব্য, এখানে অধিকাংশ চরিত্রই এক বা একাধিক আদর্শের মূর্তমান বিগ্রহ। রাম আদর্শ পুত্র, আদর্শ স্বামী, এমনকি আদর্শ নৃপতি। লক্ষ্মণ আদর্শ ভ্রাতা, দশরথ আদর্শ পিতা, সীতা আদর্শ পত্নী, হনুমান আদর্শ সখা রূপে চিত্রিত হয়েছে।[২] রামায়ণে এই চরিত্রগুলির সগর্ব পদচারণা ও কাহিনী বিন্যাসের মধ্যে দিয়ে আদিকবি বাল্মীকি সমাজের বহুবিধ অশনি সংকেতের প্রতি আমাদের বোধোদয় ঘটিয়েছেন, যদ্বারা সমাজ প্রতিনিয়ত শিকার হয়ে থাকে। ইন্দ্রিয়সংযমতাই

আদিকবি বিরচিত আর্য রামায়ণের একটি অন্যতম শিক্ষা। প্রায় সমগ্রকাব্য জুড়ে অসংযমতার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ রয়েছে। দশরথ থেকে শুরু করে শূর্পণখা, দেবরাজ ইন্দ্র, বালি, সুগ্রীব,এবং বিশেষভাবে রাক্ষসরাজ রাবণ, যিনি ক্ষমতার অতুল শীর্ষে পৌঁছেও ইন্দ্রিয়াসক্তির কারণে শেষ রক্ষা করতে পারেননি।

আদিকবি তাঁর কাব্যে দশরথকে বহুপত্নীকরূপে অঙ্কিত করছেন। দশরথের তিন পত্নীর (কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা) মধ্যে রূপগুণে অন্য পত্নীদ্বয় থেকে অতুলনীয়া ছিলেন কেকয় রাজকন্যা কৈকেয়ী; তার জগত ও জীবন অন্য পত্নীদের তুলনায় ঈষৎ স্বাতন্ত্রমন্ডিত ছিল। তিন পত্নীই রাজকীয় জীবন-যাপন করতেন, কিন্তু তাদের মধ্যে কৈকেয়ীর জীবন শৈলি ছিল স্বতন্ত্র। দশরথ তার কনিষ্ঠা পত্নীকে ঈষৎ আলাদাভাবেও দেখতেন। শুধু তা'ই নয়, মহাকবিও কেকয় রাজকন্যার প্রতি একটু বেশি আলোকপাত করেছেন, তবে একথাও অস্বীকার করা যাবে না যে, রামায়ণের সরল ও ঋজু ঘটনাবলীর করুণ পরিণতির জন্য কৈকেয়ীর ভূমিকা ছিল মূখ্য। যাইহোক, দশরথ পৌঢ়ত্বে উপনীত হয়েও কৈকেয়ীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন, সে-কারণেই অন্যান্য পত্নীরা তার প্রভাবশালিতার কাছে একেবারে ফিকে হয়ে গেছে। ভরতমাতাকেও দেখি এই সুবর্ণ সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে। তিনি জানতেন দশরথ তার প্রতিই বেশি আসক্ত, কাজেই তার বাঞ্ছিত প্রত্যাশাকে তিনি কোনো প্রকারেই অস্বীকার করতে পারবেন না।

রামায়ণে কৈকেয়ীর বরপ্রাপ্তির জন্য দেবাসুরের যুদ্ধে দশরথের আহত হওয়া এবং কৈকেয়ীর সেবা-শুশ্রূষার মাধ্যমে আরোগ্যলাভ করার ঘটনা কার্য-কারণসূত্রে গ্রথিত। কিন্তু এই ঘটনার অন্তরালে অদিকবি বৃদ্ধবয়সে সুন্দরী যুবতি পত্নীর প্রতি অবাধ ইন্দ্রিয়াসক্তির কুফল সম্পর্কে আমাদের সচেতন করেন। আর্য রামায়ণের 'আরণ্যকাণ্ডে' বনবাসিনী সর্বাঙ্গসুন্দর সীতার একাকিত্বের সুযোগ নিয়ে মুনিবেশধারী রাক্ষসরাজ রাবণ কৌতুহলী হয়ে জনক-নন্দিনীর পরিচয় জানতে চাইলে সীতা পিতৃকুল ও শ্বশুরকুলের পরিচয় দেন; এবং দশরথের বৃদ্ধ বয়সে কনিষ্ঠা পত্নীর প্রতি কামাসক্তিই পুত্রদের প্রতি তার দ্বিচারিতা এবং আজকের এই দুঃসহ বনবাসের কারণরূপে প্রতিপন্ন করেন ---

"কামার্ত্তশ্চ মহারাজঃ পিতা দশরথঃ স্বয়ম্।

কৈকেয্যাঃ প্রিয়কামার্থং তং রামং নাভ্যষেচয়ৎ ।।"[৩]

'আমার শ্বশুর কামার্ত মহারাজ দশরথ, কৈকেয়ীর প্রিয়সাধনার্থে তাদৃশ গুণবান রামচন্দ্রকে রাজপদে অভিষিক্ত করলেন না'। দশরথের এই পক্ষপাতদুষ্ট পত্নীপ্রীতি এবং পুত্রদের প্রতি তার অবিচার সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ সহ্য করতে পারেননি; পিতার এই গর্হিত আচরণকে তিনি রূঢ় ভাষায় কটাক্ষ করেছেন। এবং পুত্রশোকে বিলাপরতা রামজননী কৌশল্যাকে প্রবোধ দিয়ে দীনভাবে বলেন--

" ন রোচতে মমাপ্যেতদার্য্যে যদ্রাঘবো বনম্।

ত্যক্ত্বা রাজ্যশ্রিয়ং গচ্ছেৎ স্ত্রিয়ো বাক্যবশং গতঃ।।

বিপরীতশ্চ বৃদ্ধশ্চ বিষয়ৈশ্চ প্রধর্ষিতঃ।

নৃপঃ কিমিব ন ব্রূয়াচ্চোদ্যমানঃ সমন্মথঃ।।"[৪]

'আর্য্যে! এতে আমারও অভিরুচি হয় না যে রঘুনন্দন রাম, স্ত্রীলোকের কথায় রাজ্যশ্রী পরিত্যাগ করে বনে যান। রাজা দশরথ বিপরীত বুদ্ধি ও বিষয়াকৃষ্ট-চিত্ত ; বিশেষতঃ উনি বৃদ্ধ হয়ে কামুক হয়েছেন; সুতরাং উনি স্ত্রীলোকের কথায় কিনা করতে পারেন?'

বলাই বাহুল্য, আর্য রামায়ণের পাঠকদের কাছে লক্ষ্মণের এই দ্বিধাহীন স্বীকারোক্তি যথার্থ বলেই মনে হবে। দশরথ যে কৈকেয়ীর প্রতি অন্ধের মতো আসক্ত ছিলেন, তা তার স্বীকারোক্তিতে স্পষ্ট—

"চিরং খলু ময়া পাপে ত্বং পাপেনাভিরক্ষিতা।

অজ্ঞানাদুপসম্পন্না রজ্জুরুদ্বন্ধনী যথা।।

রমমাণস্ত্বয়া সার্দ্ধং মৃত্যুং ত্বাং নাভিলক্ষয়ে ।

বালো রহসি হস্তেন কৃষ্ণসর্পমিবাস্পৃশম্।।"[৫]

'হে পাপমনোরথে! আমি তোমাকে ক্লেশ-দায়িনী জানতে না পেরে কণ্ঠসংলগ্ন রজ্জুর ন্যায় চিরকাল রক্ষা করেছি। যেরূপ বালক অজ্ঞানতাবশতঃ ক্রীড়া করবার মানসে নির্জন প্রদেশে হাত দিয়ে কৃষ্ণসর্পকে স্পর্শ করে সেইরূপ তোমাকে স্বীয় মৃত্যু স্বরূপ জানতে না পেরে আমি রমণার্থী হয়ে তোমাকে স্পর্শ করেছি। অর্থাৎ, বালক যেমন সর্পকে স্পর্শ করে কালগ্রাসে পতিত হয়, সেইরূপ কৈকেয়ীর প্রতি আসক্তিবশতঃ তিনি মৃত্যুর অধীন হয়েছেন। শুধু তাই নয়, বৃদ্ধ বয়সে বিপরীত বুদ্ধিবশতঃ নিজকৃত নিন্দনীয় কাজের নিজেই সমালোচনা করেছেন---

"বালিশো বত কামাত্মা রাজা দশরথো ভৃশম্।

স্ত্রীকৃতে যঃ প্রিয়ং পুত্রং বনং প্রস্থাপয়িষ্যতি।।"[৬]

'সুতারাং সকল লোকেই অবশ্য আমাকে রাজা দশরথ অত্যন্ত বুদ্ধিহীন ও কামতৎপর; কেননা, তিনি রমণীর জন্য প্রিয় তনয় রামকে বনে প্রেরণ করলেন; এইরূপ বলে নিন্দা করতে পারে'। সঙ্গত কারণে পিতার এই নিন্দনীয় কাজের জন্য রামচন্দ্র হিতাভিলাসী সুমিত্রানন্দন তাকে বধযোগ্য বা বন্ধনযোগ্য করতেও সংশয় প্রকাশ করেনি---

"প্রোৎসাহিতোহয়ং কৈকেয্যা সন্তুষ্টো যদি নঃ পিতা।

অমিত্রভূতো নিঃশঙ্কং বধ্যতাং বধ্যতামপি।।"[৭]

'অতএব যদি আমাদের পিতা রাজা দশরথ, ভরতকে রাজ্য-দান বিষয়ে কৈকেয়ী কর্তৃক উৎসাহিত হয়ে সন্তুষ্টচিত্তে আমাদের সঙ্গে শত্রুর ন্যায় ব্যবহার করেন, তবে তিনিও আমাদের বধযোগ্য বা বন্ধনযোগ্য হবেন'। সুতরাং রামায়ণে কার্য-কারণসূত্রে কেকয়-রাজকন্যার বরপ্রাপ্তির উল্লেখ থাকলেও বৃদ্ধ পিতার বিপরীত বুদ্ধিজনিত কারণে কৌশল্যানন্দন রামচন্দ্রকে চৌদ্দ বছর দুঃসহ বনবাসজ্বালা ভোগ করতে হয়েছে। পিতৃকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্যই যেন শ্রীরামচন্দ্র জীতেন্দ্রিয় হয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সমাজে তখন বহুবিবাহ রীতি প্রচলিত (দশরথ বহুপত্নীক ছিলেন) থাকা সত্ত্বেও তিনি একপত্নীক ছিলেন এবং বনবাসে থাকাকালীন ব্রহ্মচর্য পালন করতেন।

রামায়ণে দেবরাজ ইন্দ্রের প্রসঙ্গ মূল কাহিনীর সঙ্গে তেমনভাবে সম্পর্কিত নয়; কিন্তু কার্য-কারণসূত্রে ভগবান গৌতমের অভিশাপ ও অহল্যার শাপমোচন সর্বোপরি ভগবান বিষ্ণুর মানবরূপে ধরায় অবতীর্ণ হওয়ার তাগিদকে বহুগুণে বৃদ্ধি করেছে। এতদ্ব্যতীত গৌতম-অহল্যা-ইন্দ্রের উপাখ্যানের মধ্যে দিয়ে আদিকবি বাল্মীকি সমাজ পরিশুদ্ধীকরণের দিকে আমাদের ইঙ্গিত করেছেন। ইন্দ্রিয়াসক্তির পরিণাম এতটাই ভয়ঙ্কর যে, এর করালগ্রাস থেকে মনুষ্য প্রজাতি থেকে শুরু করে দেব-দেবী কেউই রেহাই পায় না। বিশ্বামিত্রমুনি বালক শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে অসংযত নর-নারীর করুণ পরিণতি সম্পর্কে সচেতন করতে গৌতম ও অহল্যা উপাখ্যান শুনিয়েছিলেন। বিশ্বামিত্র মুনি কর্তৃক কথিত উপাখ্যানটি এইরূপ – একদিন গৌতমের অবর্তমানে

উপযুক্ত সময় বোধে, শচীপতি সহস্রাক্ষ মহেন্দ্র, তাঁর বেশ ধারণপূর্বক অহল্যার কাছে গিয়ে তাকে বললেন, 'সুমধ্যমে! তুমি সঙ্গমোচিত অলঙ্কারে সজ্জিত হয়ে আছ, সুতরাং তোমার সঙ্গে সঙ্গম করতে আমার বাসনা হচ্ছে, রমণার্থী ব্যক্তি রতিবিষয়ে বিহিতকালের প্রতীক্ষা করতে পারে না'। অহল্যা তাকে গৌতম-বেশধারী সহস্রাক্ষ ইন্দ্র বলে জানতে পেরেও দুর্বুদ্ধিহেতু দিব্যরমণে কুতূহলবশতঃ এইরূপ কর্ম করতে অভিপ্রায় করলেন। অনন্তর তিনি পূর্ণমনোরথা হয়ে সুরশ্রেষ্ঠকে বললেন,--

" অথাব্রবীৎ সুরশ্রেষ্ঠং কৃতার্থেনান্তরাত্মনা।

কৃতার্থাস্মি সুরশ্রেষ্ঠ গচ্ছ শ্রীঘ্রমিতঃ প্রভো।।"[৮]

'প্রভো সুরবর! আমি কৃতার্থ হলাম! এখন শীঘ্র এখান থেকে প্রস্থান করো এবং---

" আত্মানং মাঞ্চ দেবেশ সর্ব্বথা রক্ষ গৌরবাৎ।"[৯]

'সর্বপ্রকারে আমার ও আপনার গৌরব রক্ষা কর'। একইসঙ্গে মহেন্দ্রও হাসতে হাসতে বললেন; ' সুশ্রোণি! আমি তোমার প্রতি অতীব পরিতুষ্ট হয়েছি ; আমি যে স্থান থেকে এসেছি সেখানে চললাম'। মহেন্দ্র এইরূপ অহল্যার সঙ্গে সঙ্গম করে গৌতমের ভয়ে ব্যস্তভাবে সত্বর পর্ণশালা থেকে বেরলেই সুরাসুরগণের দুরাধর্ষণীয়, তপবল সমন্বিত এবং অনলের ন্যায় দীপ্তিশালী মুনিবর গৌতমকে তীর্থোদকে স্নান করে সমিৎ ও কুশ সংগ্রহপূর্বক আশ্রমে প্রবেশ করতে দেখে ত্রস্ত ও বিষণ্ণবদন হলেন। পরে সেই সদাচারী মুনি দুর্বৃত্ত সহস্রাক্ষকে আত্মবেশধারী দর্শনে ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে বললেন--

" মম রূপং সমাস্থায় কৃতবানসি দুর্ম্মতে।

অকর্ত্তব্যমিদং যস্মাদ্বিফলস্ত্বং ভবিষ্যসি।।"[১০]

'রে দুর্মতে! যেহেতু তুই আমার রূপ ধারণ করে এই অকর্তব্য কর্ম করেছিস্, এতএব তুই অণ্ডকোষবিহীন হবি। অতঃপর মহর্ষি গৌতম, ইন্দ্রের এই অবস্থা দেখে ভার্যাকেও অভিশাপ দিলেন--

" বাতভক্ষ্যা নিরাহারা তপ্যন্তী ভস্মশায়িনী।

অদৃশ্যা সর্ব্বভূতানামাশ্রমেহস্মিন্ বসিষ্যসি।।"[১১]

'রে দুর্বতে! তুই এই আশ্রমে বহুসহস্র বৎসর নিরাহারা, বাতভক্ষা, ভস্মশায়িনী ও সমস্ত প্রাণির অদৃশ্যা হয়ে অনুতাপ করে বাস করবি'। যখন এই ঘোর বনে দীনদয়াল দশরথনন্দন শ্রীরামচন্দ্রের আগমন ঘটবে তখনই সেই জীতেন্দ্রিয় পুরুষকে আতিথ্য করে লোভ-মোহবর্জিতা হয়ে স্বীয়রূপ লাভ করে পুনরায় ভগবান গৌতমের শরণাপন্ন হতে পারবে।

সুতরাং, অসংযমী নারী ও পুরুষ উভয়ই সমাজের চোখে সমদোষে দুষ্ট; সমান নিন্দনীয় – তা সে দেবই হ'ক আর মানুষই হ'ক। কাজেই মহর্ষি গৌতম এই নিন্দনীয় আচরণের শাস্তি স্বরূপ উভয়কেই শাপগ্রস্ত করেছেন। অপিচ ইন্দ্রিয়াসক্তিজনিত পাপাচারীর (অহল্যা, ভগবান গৌতমের পত্নী যিনি দেবগুণ সমৃদ্ধা দেবী) শাপমোচনে মানবরূপী জীতেন্দ্রিয় পুরুষ শ্রীরামচন্দ্রের করুণার প্রয়োজন হয়েছে। আদিকবি বাল্মীকি এই উপাখ্যানের মধ্যে দিয়ে শ্রীরামচন্দ্রকে বাল্যবয়সেই ইন্দ্রিয়সংযমতার শিক্ষা দিয়ে এর নিদারুণ পরিণতি সম্পর্কে যেমন সতর্ক করেছেন তেমনি সমাজকে পরিশুদ্ধীকরণের দায়ভারও গ্রহণ করেছেন।

রামায়ণে সীতা হরণের নেপথ্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল রাবণভগিনী শূর্পণখার। দাম্ভিকতা ও অজ্ঞানতাবশতঃ বিশ্রবানন্দন রাবণ শূর্পণখার স্বামীকে বধ করলে শোকাকুলা ভগিনীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন--

"অলং বৎসে রুদিত্বা তে ন ভেতব্যঞ্চ সর্ব্বশঃ ।।

দানমানপ্রসাদৈস্ত্বাং তোষয়িষ্যামি যত্নতঃ।"[১২]

'বৎসে! এখন বিলাপ করা বৃথা, সুতরাং তুমি বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতি কাউকে ভয় না করে স্বেচ্ছাপূর্বক ভ্রমণ করো। দান, মান এবং প্রসাদদ্বারা যত্নপূর্বক আমি তোমার সন্তোষ বিধান করবো'। এইভাবে কামরূপিণী বিকটাকৃতি রাক্ষসী শূর্পণখার আজ্ঞা প্রতিপালনে নিয়োজিত হয়েছে তারই মাতৃস্বস্রেয় ভ্রাতা রাক্ষস খর। এই শূর রাক্ষস দণ্ডকারণ্যে কামরূপী রাক্ষসদের প্রভু হয়ে রাবণভগিনীর আদেশ পালন করতো। সেই খর সেখানে নিষ্কন্টকে রাজ্য স্থাপন করলো এবং শূর্পণখাও সেই দণ্ডককাননে বসত করতে লাগলো। কিন্তু ঘটনাচক্রে শূর্পণখা বনবাসী দশরথনন্দনের মুখোমুখি হলে রামায়ণ কাহিনীর আমূল পরিবর্তন সূচিত হয়। শূর্পণখা সেই দেবতুল্য রামের কাছে গিয়ে তাঁকে দেখলো এবং পদ্মপত্রের ন্যায় আয়োতলোচন,উচ্চবদন, গজগামী, জটামন্ডলধারী, রাজলক্ষণযুক্ত, ইন্দীবর-শ্যাম, কন্দর্পোপম, মহেন্দ্রতুল্য–প্রভাবশালী ও অত্যন্ত বলবান, মহাবাহু সুকুমার রামকে দেখে কামপীড়িতা হল--

"বভূবেন্দ্রোপমং দৃষ্ট্বা রাক্ষসী কামমোহিতা।

সুমুখং দুর্ম্মুখী রামং বৃত্তমধ্যং মহোদরী।।"[১৩]

অতঃপর রাবণভগিনী কামরূপিণী শূর্পণখা অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে নিজ বংশ পরিচয় ও প্রভাবশালিতা সম্পর্কে রামচন্দ্রকে অবহিত করেন। এবং সে দশরথনন্দনের প্রতি অত্যন্ত আসক্তিবশতঃ প্রথম দর্শনেই তাঁকে পতিত্বে বরণ করেছে , সে-কথাও অকপটে স্বীকার করেছে। এমনকি বিবাহ পরবর্তী জীবনে বীর্যবতী রাবণভগিনীর সঙ্গে যথেচ্ছ ভোগসর্বস্ব জীবন যাপনের প্রস্তাব করতেও কুন্ঠিত হন না--

" ততঃ পর্ব্বতশৃঙ্গাণি বনানি বিবিধানি চ।

পশ্যন্ সহ ময়া কামী দণ্ডকান্ বিচরিষ্যসি।।"[১৪]

যাইহোক, সামাজিক বিধিনিষেধই হ'ক আর পত্নীর প্রতি অকৃত্তিম ভালোবাসাহেতু বহুপত্নীত্বের দোষবশতই হ'ক, রাম বিশ্রবানন্দিনী শূর্পণখাকে কিছুতেই আমল দিলেন না। অগত্যা রাবণভগিনীকে অন্যপথের সন্ধান নিতে হল। সে উপলব্ধি করলো সীতার প্রতি রামের অত্যধিক আসক্তিই তার প্রতি অবহেলার অন্যতম কারণ। কাজেই জনকনন্দিনী সীতাকে ভক্ষণ করলে তার সম-প্রতিযোগিনীর অবসান ঘটবে। যেমন ভাবনা তেমনই কর্ম, কামরূপিণী শূর্পণখা সীতাকে ভক্ষণ করতে গেলে, এই নিন্দনীয় কাজের জন্য তার অঙ্গবিকৃতি করা হয়। শূর্পণখা তার গর্হিত কাজের জন্য এই দণ্ডবিধানকে প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে গ্রহণ না করে বরং প্রতিহিংসাপরায়ণা হয়ে উঠলেন। অতঃপর তিনি তার সেবায় নিয়োজিত খর ও দূষণকে রামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্ররোচিত করতে থাকেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভগিনীর দর্প ও আত্মহননের শপথের কারণে তারা অগত্যা যুদ্ধে যেতে বাধ্য হন এবং পরাজিত হয়ে নিহত হন। রূপ-দর্শনজনিত এই ভোগ-লোলুপতাই শূর্পণখা এবং একইসঙ্গে রাক্ষসরাজ রাবণের জীবনে কাল হয়ে এসেছিল।

খর-দূষণ ও ত্রিশিরা রাক্ষসী যুদ্ধে নিহত হলে শূর্পণখা সহোদর ভ্রাতা রাবণকে মহাপরাক্রমশালী রাম-লক্ষ্মণভ্রাতাদ্বয়ের প্রতি বিবিধ উপায়ে যুদ্ধে প্ররোচিত করতে থাকে। কিন্তু রাবণ, ভগিনীর এই অভিযোগে কোনো সন্তোষজনক প্রতিক্রিয়া না করলে, প্রথমে রাবণের ভোগসর্বস্ব চরিত্রের পরিচয় দিয়ে শাসক হিসাবে তার অযোগ্যতার কথা বলে। শুধু তা'ই নয়, তার মতো অদূরদর্শী শাসক যে অচিরেই সিংহাসনচ্যুত হবে সে উদ্বেগও ব্যক্ত করেন--

"পরাবমন্তা বিষয়েষু সঙ্গবান্ ন দেশকালপ্রবিভাগতত্ত্ববিৎ।

অযুক্তবুদ্ধির্গুণদোষনিশ্চয়ে বিপন্নরাজ্যো নচিরাদ্বিপৎস্যসে।।"[১৫]

'তুমি অন্যের অবমাননাকারী, বিষয়াসক্ত, দেশকালবিভাগে অসমর্থ এবং গুণদোষ-নির্ণয়ে চিত্তনিবেশে অসমর্থ; অতএব অচিরেই তুমি বিপন্ন ও রাজ্যচ্যুত হবে'। অতঃপর বিশ্রবানন্দিনী শূর্পণখা ভ্রাতাকে উত্তেজিত করতে ব্রহ্মাস্ত্র ছুঁড়লেন; তিনি রাবণের কাছে জনকনন্দিনী সীতার ভুবনমোহিনীরূপের সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম বর্ণনা দিতে লাগলেন, যাতে ভোগলোলুপভ্রাতা সীতার প্রতি প্রবল আসক্তিবশতঃ ভগিনী নিগ্রহের প্রতিশোধ নিতে পারে। শুধু তা'ই নয়, সীতার মতো অনুপম লাবণ্যময়ী সুন্দরী যে কেবল রাবণেরই উপযুক্ত সে-কথাও নির্দ্বিধায় ব্যক্ত করেছে--

" সা সুশীলা বপুঃশ্লাঘ্যা রূপেণাপ্রতিমা ভুবি।

তবানুরূপা ভার্য্যা সা ত্বঞ্চ তস্যাঃ পতির্বর।।"[১৬]

'পৃথিবীতে অনুপম-লাবণ্যবতী, শ্লাঘনীয় দেহা, বিস্তৃত-জঘনা, প্রসন্তবদনা এবং পীন ও উন্নত পয়োধরা সেই সুশীলা সীতা কেবল আপনারই ভার্যা হবার উপযুক্ত পাত্রী'। অপিচ শূর্পণখা স্বয়ং সীতাকে রাবণের পত্নী দাবী করতে গিয়ে-ই যে এইরূপ বিরূপিতা হয়েছে সে-কথাও অত্যন্ত খেদের সঙ্গে প্রকাশ করেন। ফলতঃ কামাচারী রাবণ সীতার অতূল্য রূপ-শ্রবণে উন্মত্ত হয়ে তাঁকে হরণ করেন; যার অবশ্যম্ভাবী ফল রামায়ণে রাম-রাবণের যুদ্ধ এবং রাবণবধ।

আদিকবি বাল্মীকি বিরচিত আর্য রামায়ণে বালী-সুগ্রীব যুদ্ধকথাও একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যেখানে বালির দুর্বুদ্ধিবশতঃ তিনি রাজ্যচ্যুত ও নিহত হয়েছিলেন। সুগ্রীবের জ্যৈষ্ঠভ্রাতা বালী পিতার অত্যন্ত স্নেহাসক্ত ছিলেন। সুগ্রীব নিজেও তাকে অতিশয় ভক্তি করতেন, কিন্তু যে-অনিবার্য কারণে দুই ভ্রাতার মধ্যে শত্রুতার সম্পর্ক তৈরি হয়, তার নেপথ্যে রয়েছে সুগ্রীব-পত্নী রুমাকে হরণ। উপাখ্যানটি এইরূপ – মহাতেজা দুন্দুভি-নামক অসুরের জ্যেষ্ঠপুত্র মায়াবীর সঙ্গে এক রমণীকে কেন্দ্র করে বালীর শত্রুতা জন্মেছিল। একদিন রাত্রে সকলে নিদ্রিত হলে সেই মায়াবী রাক্ষস বালিকে যুদ্ধে আহ্বান করেন। বালী যথারীতি যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত হলে সুগ্রীব সৌহার্দবশতঃ দাদার সঙ্গ নেন। অবস্থা প্রতিকূল বুঝে সেই মায়াবী অসুর তৃণাবর্ত অতি দুর্গম এক বৃহৎ বিবরমধ্যে সবেগে প্রবেশ করে। বালী শত্রুকে গর্তমধ্যে প্রবেশ করতে দেখে ক্রোধে আরক্ত হয়ে ভ্রাতাকে বললেন, যতদিন না সে শত্রুনিধন করে ফিরে আসছে ততদিন সুগ্রীব গর্তদ্বারে প্রতীক্ষায় থাকবে। সুগ্রীব এক-বৎসরকাল প্রতীক্ষার পর সেই গর্ত থেকে সফেনরক্ত নির্গত হতে দেখে অত্যন্ত দুঃখিত হন; কেননা তখন কেবল গর্জনকারী অসুরের গর্জনধ্বনিই তার কর্ণগোচর হচ্ছিল। সুগ্রীব এই সকল অশনীসংকেতদ্বারা ভ্রাতা বালীকে নিহত মনে করে এক পর্বতপ্রমাণ প্রস্তরদ্বারা গর্তদ্বার রুদ্ধ করলেন; এবং শোকাকূল হয়ে ভ্রাতার উদকক্রিয়া সম্পাদন করে কিস্কিন্ধ্যানগরীতে ফিরে এলেন। অতঃপর মন্ত্রীগণ ও সভাসদেরা বালীর অবর্তমানে সুগ্রীবকে রাজ্যাভিষিক্ত করলেন। এবং তিনি স্বচ্ছন্দে রাজ্য শাসনও করতে লাগলেন। এ-দিকে বালী মায়াবী রাক্ষসকে বধ করে সুগ্রীবকে রাজ্যে অভিষিক্ত দেখে ক্রোধে আরক্তলোচন হয়ে রাজ্যাভিষেককারী আমাত্যগণকে বেঁধে তিরস্কার করতে লাগলেন। সুগ্রীব হৃষ্টচিত্তে নিজের রাজমুকুটদ্বারা তার পাদস্পর্শ করে দীনতা প্রকাশ করলেন, তথাপি সে ভ্রাতার প্রতি প্রসন্ন হলেন না,--

"নত্বা পাদাবহং তস্য মুকুটেনাস্পৃশং প্রভো।

অপি বালী মম ক্রোধান্ন প্রসাদং চকার সঃ।।"[১৭]

এখন কথা হল, সুগ্রীব তো বালীকে স্বেচ্ছায় তার প্রত্যাশিত রাজ্য ফিরিয়ে দিতে রাজী ছিলেন এবং পূর্বে মতোই ভৃত্যের ন্যায় জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে সেবা-শুশ্রূষা করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন। এতদ্‌সত্ত্বেও বানররাজ বালী সুগ্রীবকে উত্তরীয়টুকু নেওয়ার সুযোগ না দিয়ে তাকে যৎপরিনাস্তি গালমন্দ করে বিতাড়িত করলেন --

"এবমুক্তা তু মাং তত্র বস্ত্রেণৈকেন বানরঃ।

তদা নির্ব্বাসয়ামাস বালী বিগতসাধ্বসঃ।।"[১৮]

মোদ্দাকথা, কামাচারী বালী সুগ্রীবপত্নী রুমার প্রতি আসক্তিবশতঃ ভ্রাতাকে তার প্রিয়তমা পত্নীর সাহচর্য থেকে বঞ্চিত করে তাকে নির্বাসন দেন। রাজ্যের প্রতি সুগ্রীবের কোনো লোভ ছিল না; কেবল প্রিয়তমা পত্নীকে হারিয়ে তিনি পত্নীহারা রামচন্দ্রের মতোই দুঃখী ছিলেন --

"ঋষ্যমূকং গিরিবরং ভার্য্যাহরণদুঃখিত ।

প্রবিষ্টোহস্মি দুরাধর্ষং বালিনঃ কারণান্তরে।।"[১৯]

'আমি ভার্যাহরণ বশতই দুঃখিত হয়ে তার ভয়ে সাগর ও বন পরিবেষ্টিত সমগ্র ভুমণ্ডল পরিভ্রমণ করেছি, অবশেষে এই ঋষ্যমূকনামক পর্বতে প্রবিষ্ট হয়েছি'।

রামচন্দ্র ও সুগ্রীব উভয়ে রাজ্য এবং প্রিয়তমা পত্নী হারিয়ে বনবাসী হয়েছিলেন; এবং প্রত্যেকেই পত্নীবিয়োগজনিত দুঃখে দুঃখী ছিলেন। কাজেই সুগ্রীব ও রাম উভয়ে পত্নী অন্বেষণে যত আন্তরিকতা দেখাবেন, কামাচারী বানররাজ বালীর কাছ থেকে সেই সহযোগিতা পাওয়া যেত কিনা সন্দেহ ছিল। সে-কারণে সুগ্রীবের তুলনায় বানররাজ বালী অপেক্ষাকৃত বীর্যশালী হওয়া সত্ত্বেও আদর্শগতভাবে কামাচারী বালীকে রাম কখনোই নিজের হিতাকাঙ্ক্ষী বা দোসর মনে করতে পারেননি, বালীও সেই বিশ্বাসযোগ্যতা উৎপাদন করতে ব্যর্থ ছিলেন। কাজেই, রাম প্রিয়তমা পত্নী সীতার অন্বেষণে পত্নীহারা, রাজ্যহারা সুগ্রীবকেই দোসর মনে করেছিলেন। অপিচ রণদুর্মদ বালীকে অন্যায় যুদ্ধে কেন বধ করা হল, বালীর এই খেদোক্তির যুক্তিসংগত কারণ হিসাবে রাম তার (বালী) ভগিনীসম ভ্রাতৃবধূর প্রতি ইন্দ্রিয়াসক্তির পাপকর্মকেই দায়ী করেছে --

"তদেতৎ কারণং পশ্য যদর্থং ত্বং ময়া হতঃ।

ভ্রাতুর্বর্ত্তসি ভার্য্যায়াং ত্যক্ত্বা ধর্ম্মং সনাতনম্।।

অস্য ত্বং ধরমাণস্য সুগ্রীবস্য মহাত্মনঃ।

রুমায়াং বর্ত্তসে কামাৎ স্নু ষায়াং পাপকর্ম্মকৃৎ।।

তদ্‌ব্যতীতস্য তে ধর্ম্মাৎ কামবৃত্তস্য বানর।

ভ্রাতৃভার্য্যাভিমর্ষেহস্মিন্ দণ্ডোহয়ং প্রতিপাদিতঃ।।"[২০]

'আমি যে কারণে তোমাকে বধ করেছি, সেই কারণ এই দেখ; তুমি সনাতন ধর্ম পরিত্যাগ করে কনিষ্ঠ ভ্রাতার পত্নীতে অভিগমন করেছ। কপিবর! এই মহাত্মা সুগ্রীব তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, অতএব এর পত্নী তোমার পুত্রবধূতুল্যা; কিন্তু তুমি কামপরবশ হয়ে এর জীবিতাবস্থাতেই তার স্ত্রীতে উপগত, সুতরাং নিতান্ত ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র, সনাতন-ধর্মভ্রষ্ট এবং পাপাচারী হয়েছ; তোমার কনিষ্ঠভ্রাতৃ-ভার্যাগমন অপরাধে আমি তোমার এইরূপ দন্ডবিধান করেছি। এছাড়াও স্মৃতিশাস্ত্রে উল্লেখ আছে --

" ঔরসীং ভগিনীং বাপি ভার্য্যাং বাপ্যনুজস্য যঃ।

প্রচরেত নরঃ কামাত্তস্য দণ্ডো বধঃ স্মৃতঃ।।"[২১]

বানররাজ বালী কর্তৃক রাজ্যচ্যুত সুগ্রীব পত্নী ও রাজ্য হারা হয়ে বনবাসী হয়েছিলেন। সুগ্রীব মহাপরাক্রমশালী রামকে পত্নী অন্বেষণে সহায়তা করবে এবং দশরথনন্দন রাম সুগ্রীবের হারানো রাজ্য ও পত্নীকে ফিরিয়ে দেবার যাবতীয় ব্যবস্থা করবে। কিন্তু বালীভ্রাতা সুগ্রীব সিংহাসনে আসীন হয়ে এতটাই ভোগসর্বস্ব জীবন-যাপনে মত্ত থাকেন যে, তিনি পূর্ব-প্রতিশ্রুতি বেমালুম

ভুলে গেলেন। সীতার অন্বেষণের জন্য সুগ্রীবের দেওয়া নির্ধারিত সময় (বর্ষাকাল) পেরিয়ে গেলেও তার পক্ষ থেকে কোনো প্রকার সন্তোষজনক উদ্যোগের ব্যবস্থা না দেখতে পেয়ে লক্ষ্মণ অত্যন্ত কোপান্বিত হয়ে সুগ্রীবের আলয়ে যান। সুগ্রীবের প্রধান প্রধান অনুচরেরা তাকে লক্ষ্মণের ক্রোধ এবং আগমবৃত্তান্ত জ্ঞাপন করলেও তিনি তারার (বালীপত্নী) সঙ্গে এতটাই বিহারসুখে মত্ত ছিলেন যে, তাদের কথার তো কোনো গুরুত্বই দিলেন-ই না, উপরন্তু লক্ষ্মণের অসময়ে আগমনের কারণ হিসাবে সভাসদ ও গুপ্তচরদের তার-ই বিরুদ্ধে চক্রান্তকারী ও ছিদ্রান্বেষী মনে করলেন,---

" ন মে দুর্ব্ব্যাহৃতং কিঞ্চিন্নাপি মে দুরনুষ্ঠিতম্।

লক্ষ্মণো রাঘবভ্রাতা ক্রুদ্ধঃ কিমিতি চিন্তয়ে।।

অসুহৃদ্ভির্মমামিত্রৈর্নিত্যমন্তরদর্শিভিঃ।

মম দোষানসম্ভূতান্ শ্রাবিতো রাঘবানুজঃ।।"[২২]

'আমি রামকে কোনো দুর্বাক্য বলিনি এবং তাঁর কোনো ক্লেশকর দুষ্কার্যও করিনি; তবে রামের ভ্রাতা লক্ষ্মণ আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হলেন কেন? সুতরাং আমার মনে হয় যে, আমার অপমানকারী এবং শতত ছিদ্রান্বেষী শত্রুগণ সেই লক্ষ্মণকে আমার অসম্ভূত দোষ দেখিয়ে থাকবে'। অথচ আমরা অনায়াসেই উপলব্ধি করতে পারি যে, বানরবীর প্রমত্ত অবস্থায় থেকে বর্তমান উদ্‌যোগকালের সমস্ত কিছুই বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন, তাকে স্মরণ করাবার জন্যই লক্ষ্মণের এই অসময়ে আগমন।

যাইহোক, লক্ষ্মণ সেই অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করলে কেবল ভোগ-লক্ষণযুক্ত চিহ্নই তার চোখে পড়ল – সেখানে সমতাল, পাদ এবং অক্ষরসংযুক্ত তন্ত্রীগীতসমাকীর্ণ সুমধুর ধ্বনি শুনতে পেলেন এবং সেখানে বিবিধাকারা রূপ-যৌবন গর্বিতা সুন্দরী স্ত্রীসকল দেখতে পেলেন। এরপর মহাবীর লক্ষ্মণ নূপূর এবং কাঞ্চীরব শুনে অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়ে এই ভোগসর্বস্ব পাপকর্মের প্রতিবাদস্বরূপ জ্যাশব্দে চতুর্দিক আলোড়িত করলেন। স্বভাবতই পরিস্থিতি প্রতিকূল বুঝে সুগ্রীব প্রয়াত বালীপত্নী তারাকে কমললোচন লক্ষ্মণের মুখোমুখি হতে বলেন। এখানে আদিকবি তারার যে চিত্র এঁকেছেন তাতে তার ভোগসর্বস্ব জীবনকেই দ্যোতিত করেছে,--

" সা প্রস্খলন্তী মদবিহ্বলাক্ষী

প্রলম্বকাঞ্চীগুণহেমসূত্রা।

সলক্ষ্মণা লক্ষ্মণসন্নিধানং

জগাম তারা নমিতাঙ্গযষ্টিঃ।।"[২৩]

'যার দেহযষ্টি স্তনভারে অবনত, চরণদ্বয় মদজন্য অলসতায় বিচলিত এবং মধুপানজন্য নয়নযুগল চঞ্চল, সেই শুভলক্ষণ লম্ববানকাঞ্চী এবং হেমসূত্রধারিণী তারা, সুগ্রীবের নিয়োগানুসারে লক্ষ্মণের কাছে গেলেন'। যাইহোক, সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সুগ্রীবের এ-হেন ইন্দ্রিয়পরায়নতা মোটেও সন্তোষ বিধান করতে পারেনি, সে কারণে তিনি তারার কাছে কামাচারী সুগ্রীবের এই নিন্দনীয় আচরণের যৎপরিনাস্তি তিরস্কার করেছেন,--

" কিময়ং কামবৃত্তস্তে লুপ্তধর্ম্মার্থসংগ্রহঃ।

ভর্ত্তা ভর্ত্তৃহিতে যুক্তে ন চৈবমববুধ্যসে।।

ন চিন্তয়তি রাজ্যর্থং সোহস্মান্ শোকপরায়ণান্।

সামন্যপরিষত্তারে কামমেবোপসেবতে।।"[২৪]

'ভর্তৃহিতকারিণী! তোমার পতি সুগ্রীব কামপ্রবৃত্তি অবলম্বন করে যে, ধর্ম ও অর্থলোপ করতে বসেছে, তা কি তুমি জান না? তিনি রাজ্যের স্থিরতার জন্য সামান্য পারিষদবর্গে পরিবৃত হয়ে অনুক্ষণ কামসেবা করছেন; কিন্তু আমরা যে শোকে নিমগ্ন হয়ে আছি সে-বিষয়ে একবারও চিন্তা করছে না'। অর্থাৎ, কপিবর সুগ্রীব কামাসক্ত হয়ে প্রিয়জনের দ্বারা আবদ্ধ ছিলেন, সেই কারণে চারমাস পরে শরৎকালে রামপত্নী সীতার অন্বেষনের কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন। কিন্তু তারা(বালীপত্নী), প্রতিশ্রুতিভঙ্গকারী ইন্দ্রিয়াসক্ত সুগ্রীবের পক্ষাবলম্বন করে সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে কামের সর্বগ্রাসী অবশ্যম্ভাবী পরিণতির কথা বলেন,--

"ন কামতন্ত্রে তব বুদ্ধিরস্তি

ত্বং বৈ যথা মন্যুবশং প্রসন্নঃ।

ন দেশকালৌ হি যথার্থধর্ম্মৌ

অবেক্ষতে কামরতির্ম্মনুষ্যঃ।।"[২৫]

'অর্থাৎ, মানুষেরা কামাসক্ত যেখানে দেশ,কাল, ধর্ম এবং বিষয়ে বিবেচনা করতে পারে না, এমনকি যখন ধর্ম এবং তপোনিষ্ঠ মহর্ষিরাও কামার্ত হয়ে ভার্যাসুখে বিমোহিত হন, তখন স্বভাবতঃ চঞ্চল, এই বানরজাতি কপিরাজ স্ত্রীসম্ভোগসুখে কেন মত্ত হবে না'?

বাল্মীকি রামায়ণের 'সুন্দরকাণ্ডে' অশোককাননে সীতা-হনূমান কথোপকথন প্রসঙ্গে জনকনন্দিনী সীতা তাঁর পূর্বস্মৃতি চারণকালে ছদ্মবেশী ইন্দ্রপুত্র জয়ন্তকাকের ঘটনাটি ব্যক্ত করেন। একদিন সীতা তাঁর প্রিয়তম পতির সঙ্গে নানাবিধ ফুলরাশির সৌরভে আমোদিত পার্বতীয় উপবন সকল উপভোগ করে বিশ্রাম করলে ; এক কাক মাংসাভিলাসী হয়ে তাঁর স্তনদ্বয়ে চঞ্চুদ্বারা আঘাত করছিল। সীতা নানা উপায় অবলম্বন করে তাকে নিবারিত করবার চেষ্টা করলেও সেই বালিভোজী কাক সেই স্থানেই লীন হয়ে রইল, কিছুতেই অন্যস্থানে গেল না। সীতা তখন লজ্জিতা হলেন এবং ভক্ষলোলুপ কাক কর্তৃক বিদারিত হয়ে রামের শরণাপন্ন হলেন। মহাবাহু রাম জনকনন্দিনীর বক্ষঃস্থলে ক্ষত দেখে বিষধর সর্পের ন্যায় নিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক বললেন,--

"কেন তে নাগনাসোরু বিক্ষতং বৈ স্তনান্তরম্।

কঃ ক্রীড়তি সরোষেণ পঞ্চবক্ত্রেণ ভোগিনা।।"[২৬]

পরে ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করে সীতার অভিমুখে অবস্থিত রক্তময় তীক্ষ্ণনখরযুক্ত পক্ষীবর কাককে (জয়ন্ত) দেখতে পেলেন। পরে জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ মহাবাহু রাম ক্রোধে দর্ভমুষ্টি থেকে একটি দর্ভ নিয়ে মন্ত্রপূত করে ব্রহ্মাস্ত্রে যোজন করলেন এবং কপটরূপী জয়ন্তকাকের দিকে নিক্ষেপ করলেন। আকাশ পথে নিক্ষিপ্ত সেই দর্ভকটি কাকের পিছু পিছু ধাবিত হলে পরিত্রাণাভিলাসী কাক বিবিধগতি অবলম্বন করে সত্যলোক পর্যন্ত ভ্রমণ করলো। কিন্তু, কপটরূপী কাকের নিন্দনীয় কাজের জন্য নিজ পিতা, মহর্ষিগণ এবং ব্রহ্মার কাছেও আশ্রয় না পেয়ে শরণাগতবৎসল রামের শরণাপন্ন হলেন। রাম দয়াপরবশ হয়ে জয়ন্তকাককে প্রাণ রক্ষা করলেন বটে, কিন্তু এই গর্হিত আচরণের দণ্ডস্বরূপ তার ডান চোখ বিনষ্ট করলেন। আদিকবি তাঁর আর্য রামায়ণে এইভাবেই কামীর রূপদর্শনজনিত পাপের সুকঠিন শাস্তি বিধান করেছেন।

আদিকবি বাল্মীকি তাঁর আর্য রামায়ণে বিশ্রবানন্দন রাবণকে এঁকেছেন ইন্দ্রিয়ভোগলোলুপতার চূড়ান্ত প্রতীকরূপে। ষড়রিপুর (কাম, ক্রোধ, লোভ,মোহ,মদ ও মাৎসর্য্য) কারো হাত থেকেই তিনি রেহাই পাননি; এর মধ্যে ইন্দ্রিয়াসক্তির প্রতি তার অমোঘ

আকর্ষণ ছিল। তাই বিজয়ীর গর্বে স্বর্গ-মর্ত-পাতাল যেখানেই তিনি আধিপত্য বিস্তার করতেন, সেখানকার অসহায় সুন্দরী নারীদেরকে অপহরণ করে তাদের সঙ্গে জোরকরে মিলিত হতেন,---

" নিবর্ত্তমানঃ সংহৃষ্টো রাবণঃ স দুরাত্মবান্।

জহ্রে পথি নরেন্দ্রর্ষিদেবদানবকন্যকাঃ।।

দর্শনীয়াং হি যাং রক্ষঃকন্যাং স্ত্রীং বাথ পশ্যতি।

হৃত্বা বন্ধুজনং তস্যা বিমানে তাং রুরোধ সঃ।।"[২৭]

দুরাচারী রাবণ কেবল এই কন্যাদের হরণ করেই সন্তুষ্ট থাকতেন না, তাদের প্রিয় আত্মীয়-স্বজনদের নির্মমভাবে হত্যা করতেন। অথচ পাপাচারী রাবণ, তার এই অপকর্মের জন্য বিন্দুমাত্র অনুশোচনা বোধ করতেন না। এই কন্যারা তাদের প্রিয়জনদের হারিয়ে সর্বদা বিলাপ করতেন এবং পতি ভিন্ন অন্য পুরুষে পতিরূপ আচরণ করতেও পরাম্মুখ ছিলেন; কিন্তু দুর্বৃত্ত রাবণ এই অসহায় কন্যাদের সঙ্গে সর্বদা কামভোগে লিপ্ত থাকতেন। যাইহোক, রাবণের এই যথেচ্ছ কামপ্রবৃত্তি ও অত্যাচারে অতীষ্ট হয়ে রোরুদ্বমানা কন্যারা রাবণের মৃত্যু কামনা করে,--

" ইদং ত্বসদৃশং কর্ম্ম পরদারাভিমর্শনম্।

যস্মাদেষ পরক্যাসু রমতে রাক্ষসাধমঃ।।

তস্মাদ্বৈ স্ত্রীকৃতেনৈব বধং প্রাপ্স্যতি দুর্ম্মতিঃ।"[২৮]

'এই পরস্ত্রীহরণ বিসদৃশ কর্ম, কিন্তু এই রাক্ষসাধম পরকীয়া রমণীতেই রমণ করছে; সুতরাং দুর্মতি রাক্ষস স্ত্রীর কার্যদ্বারাই বধ লাভ করবে'। সেই পতিপ্রণা রমণীরা এইরূপ বললে, আকাশে দুন্দুভি-সকল বাজতে থাকে এবং সম্মতিসূচক পুস্পবৃষ্টি হতে থাকে। কামাচারী রাবণ এইভাবে সুচরিত্রা, পতিব্রতা স্ত্রীগণ কর্তৃক এককালে অভিশপ্ত হয়ে তেজবিহীন ব্যক্তির ন্যায় প্রভাহীন এবং বিমনা হলেন।

রাক্ষসরাজ রাবণের কামপ্রবৃত্তি এতটাই দুর্দমনীয় ছিল যে, তিনি নিজের ভ্রাতৃবধূকে পর্যন্ত বলাৎকার করতে কুন্ঠিত হননি। একদিন রম্ভা নানা অলঙ্কারে ভূষিতা হয়ে কুবেরনন্দন নলকুবেরের উদ্দেশে অভিসারিকা হলে, রাবণ তাঁর পথ আটকে দেন; এবং রম্ভার হাজারো অনুনয় বিনয় অগ্রাহ্য করে নিষ্ঠুরভাবে মিলিত হন এবং যথেচ্ছা ধর্ষণ করেন,--

" পতিরপ্সরসাং নাস্তি ন চৈকস্ত্রীপরিগ্রহঃ।

এবমুক্ত্বা স তাং রক্ষো নিবেশ্য চ শিলাতলে।।

কামভোগাভিসংরক্তো মৈথুনায়োপচক্রমে।

সা বিমুক্তা ততো রম্ভা ভ্রষ্টমাল্যবিভূষণা।।"[২৯]

'সেই রাক্ষস রাবণ এইকথা বলে কামভোগে অত্যন্ত আসক্ত হয়ে পড়লেন। তখন রাবণ, রম্ভাকে শিলাতলে রেখে রতি-সম্ভোগ করবার উপক্রম করল। সেই রম্ভা, সম্ভোগ শেষ হলে মুক্তি পেল। তখন কুসুমশালিনী লতা যেমন বায়ুবেগে আলোড়িত হয়ে সৌন্দর্যবিহীনা হয়, রম্ভা সেইরূপ সৌন্দর্যবিহীনা হল'। কুবেরনন্দন প্রিয়তমা রম্ভার তাদৃশ অবস্থা দেখে মুহূর্তকাল মধ্যে রাবণের দুষ্কার্য যেনে অত্যন্ত কোপান্বিত হন এবং রাবণের উদ্দেশে নিদারুণ শাপ দেন,--

"অকামা তেন যস্মাত্ত্বং বলাদ্ভদ্রে প্রধর্ষিতা।।

তস্মাৎ স যুবতীমন্যাং নাকামামুপযাস্যতি।

যদা হ্য কামাং কামার্ত্তো ধর্ষয়িষ্যতি যোষিতম্।।

মুর্দ্ধা তু সপ্তধা তস্য শকলীভবিতা তদা।"[৩০]

'ভদ্রে! তুমি অকামা হলেও যখন সে তোমাকে বলদ্বারা প্রধর্ষিত করেছে, তখন সে অপরা অকামা কোনো যুবতী কামিনীকে আর সম্ভোগ করতে পারবে না। যখন সে মদন-পীড়িত হয়ে অকামা নারীকে ধর্ষিতা করবে, তখনই তার মস্তক সপ্তধা বিভক্ত হয়ে পড়বে'। আর এটাই ছিল কামাচারী রাবণের ইন্দ্রিয়াসক্তিজনিত পাপাচারের চূড়ান্ত করুণ পরিনতি। এই কারণে রাবণ সীতাকে অপহরণ করলেও তার সঙ্গে মিলিত হতে পারেনি। অশোককাননে জনকনন্দিনীকে বন্দিনী করে চেড়ীদের দিয়ে নানাভাবে প্রলোভন এবং ভীতি প্রদর্শন করানো হত, যাতে সীতা রাবণের সঙ্গে স্বেচ্ছায় মিলিত হতে চান।

রামায়ণে বেদবতী উপাখ্যানটিও দুর্বৃত্তাচারী রাবণের ইন্দ্রিয়-ভোগলালসার এক মাইল ফলক। মহর্ষি কুশধ্বজ আজীবন বেদাভ্যাস অনুশীলনের পুরস্কারস্বরূপ বেদবতী-নামে এক অপূর্ব গুণিন কন্যা-সন্তানের অধিকারী হন। তিনি চেয়েছিলেন তার এই সর্বাঙ্গসুন্দর কন্যাকে ভগবান বিষ্ণুর হস্তে সমার্পণ করবেন; সেই কারণে যক্ষ, রক্ষ দেব- কাউকেই কন্যার বাগদত্তা হিসাবে গ্রহণ করেননি। এ-দিকে দানব শম্ভু কুশধ্বজের এই অভিপ্রায়ে সন্তুষ্ট হতে না পেরে তাকে নিদ্রারত অবস্থায় বধ করেন এবং তার শোকাকূলা সহধর্মিণী সহমরণে যান। নিরুপায়া বেদবতী পিতার অভিপ্রায়কে ফলপ্রসু করতে ঘোরতর অরণ্যে কঠোর তপস্যায় নিরত হলেন; ঘটনাচক্রে রাবণ বেদবতীর সম্মুখিন হলে তিনি এই কন্যার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন। কুশধ্বজনন্দিনী বেদবতী বারংবার ভগবান বিষ্ণুকে তার পতিরূপে বরণ করবার কথা বললেও রাবণ তাতে বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করলেন না। অপিচ এই ঘোর যৌবনে তপস্বিনীর বেশ ধারণ করে সে যে যৌবনের বিরুদ্ধাচারণ করছে, সে কথাও ব্যক্ত করেন। শুধু তা'ই নয়, তার মতো বীর্যশালী পুরুষ যে ত্রিভুবনে দুর্লভ সে কথাও জাহির করে বলতে শোনা যায়,--

" বীর্য্যেণ তপসা চৈব ভোগেন চ বলেন চ।

স ময়া নো সমো ভদ্রে যং ত্বং কাময়সেহঙ্গনে।।"[৩১]

যাইহোক, ভগবান বিষ্ণু সম্পর্কে দুর্বৃত্তাচারী রাবণের কটূক্তি কুশধ্বজনন্দিনী বেদবতীকে সন্তোষ বিধান করতে পারেনি; এবং তিনি রাবণের শুভবোধ সম্পর্কে সচেতন করলে রাবণ তার কেশ আকর্ষণ করে ধর্ষণা করেন,--

" এবমুক্তস্তয়া তত্র বেদবত্যা নিশাচরঃ।

মুর্দ্ধজেষু চ তাং কন্যাং করাগ্রেণ তদাস্পৃশৎ।।"[৩২]

অতঃপর, কৃষ্ণমৃগচর্ম পরিধানা বেদবতী নিজেই কোপান্বিত হয়ে তার নখরযুক্ত হাতে সমস্ত কেশনিচয় কেটে ফেলেন এবং দুর্বৃত্তাচারী রাবণের দ্বারা ধর্ষিতা হয়ে তাকে অভিশপ্ত করেন,--

" যস্মাত্তু ধর্ষিতা চাহং ত্বয়া পাপাত্মনা বনে।

তস্মাত্তব বধার্থং হি সমুৎপৎস্যত্যহং পুনঃ।।"[৩৩]

'তুই পাপাত্মা হয়ে, কেশস্পর্শ দ্বারা বনমাঝে আমাকে ধর্ষিত করেছিস্; অতএব তোর বধের জন্য আমি পুনরায় ধরাধামে জন্মগ্রহণ করব'। অর্থাৎ, সত্যযুগের বেদবতীই ত্রেতাযুগে অযোনীসম্ভূতা জনকনন্দিনী সীতারূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। বিশ্রবানন্দন রাবণের সংযমতার অভাব-ই সীতা হরণের কারণ; যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি রাম-রাবণের যুদ্ধ এবং রাবণ সংহার।

যাইহোক, রাবণ ছলে-বলে-কৌশলে সীতাকে অপহরণ করলেও নলকুবের কর্তৃক অভিশপ্ত হওয়ায় জনকনন্দিনীকে তিনি ধর্ষণা করতে পারেননি। সেই কারণে সীতাকে অশোককাননে বন্দিনী করে এক বৎসর সময় দিয়েছিলেন, এই সময়কালের মধ্যে সীতা স্বেচ্ছায় রাবণের সঙ্গে মিলিত হতে না চাইলে তাঁকে হত্যা করা হবে বলে জানিয়ে দেওয়া হয়। পরিণামদর্শী বিভীষণ জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাবণের এই নিন্দনীয় কাজের সমালোচনা করে তাকে সুপথে আনবার চেষ্টা করেও বিফল হন। কেননা, রাবণ ছিলেন অসংযত আত্মা ও মনের বশীভূত, সে-কারণে তিনি আত্মোপলব্ধিতে অক্ষম ছিলেন। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পরমভক্ত তথা সখা অর্জুনকে উপদেশ দিয়ে বলেছেন,--

" অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।

বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোবাপ্তমুপাযতঃ।।"[৩৪]

'অসংযত চিত্ত-ব্যক্তির পক্ষে আত্ম-উপলব্ধি দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু যার মন সংযত এবং যিনি যথার্থ উপায় অবলম্বন করে মনকে বশ করবার চেষ্টা করেন, তিনি অবশ্যই সিদ্ধি লাভ করেন। তাই, রাবণবধের পর বিলাপরতা মন্দোদরী রাক্ষসকুল ধ্বংসের নেপথ্যে রাবণের অসংযত কাম-ক্রোধজনিত ব্যসনকেই দায়ী করেছেন,--

" কামক্রোধসমুত্থেন ব্যসনেন প্রসঙ্গিনা।

নিবৃত্তস্ত্বৎকৃতে নার্থঃ সোহয়ং মূলহরো মহান্।।

ত্বয়া কৃতমিদং সর্ব্বমনাথং রাক্ষসং কুলম্।।"[৩৫]

'তোমারই কামক্রোধজনিত ব্যসনে আমাদের সমূলে উচ্ছেদকর এই বিমর্ষ অনর্থ ঘটল। তুমি এই রাক্ষসকুল অনাথ করলে'।

রামায়ণ এক বহু আলোচিত ও বহু বিতর্কিত গ্রন্থ। কাল-কালান্তর ধরে বহুবিধজাতি তাদের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের মাধ্যম হিসাবে রামায়ণের চর্চা করতেন। আদিকবি তাঁর আর্য রামায়ণে বিবিধ চরিত্র ও ঘটনার অনুসঙ্গে ইন্দ্রিয়াসক্তির শোচনীয় পরিণাম সম্পর্কে সমকালিন সমাজকে যে শিক্ষা দিয়েছেন, তা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। প্রাচীন আর্য-সংস্কৃতি যেদিন তার বীরত্বকে বিসর্জন দিয়ে ভোগবাদী আদর্শের কাছে আত্মসমার্পণ করেছিল সেদিন ভারতবর্ষ বহির্শত্রুর কাছে ধরাশায়ী হয়েছিল; কালীদাসের কাল এবং ভারতবর্ষের মধ্যযুগের ইতিহাস আমাদের এই সাক্ষ্যই দেয়। বাল্মীকি মূলত ভোগবাদী জীবনাদর্শের প্রতি বিতৃষ্ণ ছিলেন,এবং ভারতীয় সংস্কৃতির মূল কথাই– ভোগে নয়; ত্যাগেই জীবনের প্রকৃত সার্থকতা। সে-কারণে ভারতীয় উপমহাদেশের কালজয়ী দুই মহাকাব্যের পরিসমাপ্তিও হয়েছে মহাপ্রস্থানের পথে। সুতরাং, রামায়ণে রাবণবধের কারণস্বরূপ তার অহংকার, দাম্ভিকতা ও যুদ্ধপ্রিয়তাকে যতই দায়ী করা হোক না কেন, নারীজাতির প্রতি অপ্রতিরোধ্য আসক্তি এবং ভোগবাদী জীবনাদর্শে বিশ্বাসই রাক্ষসকুল ধ্বংসের মূল কারণ। আর্যকবি তাঁর রামায়ণে সমাজকে শুদ্ধীকরণের যে শিক্ষা দিয়েছেন, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণির মানুষের সমান বিশ্বাসযোগ্যতা ও প্রাসঙ্গিকতা আজও অর্জন করে চলেছে।

তথ্যসূত্রঃ

১। অসিতকুমার, বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত; *'কৃত্তিবাসের রামায়ণ পাঁচালি'*, প্রথম খণ্ড, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা (২০১৬-২০১৭), পৃষ্ঠা-৩৫০।

2। Ramayana through the Ages – Rama-Gatha in different versions, Avadhesh Kumar Singh(editor), *'Valmiki Ramayana The Sanskrit Epic'* D.K.Printworld(p) Ltd. New Delhi, page no, 48.

৩। রামায়ণম্, শ্রীমন্মহর্ষি-বাল্মীকি-বিরচিতম্, পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপঞ্চানন তর্করত্নেন(সম্পাদিতম্), বেণীমাধব শীল'স লাইব্রেরী, কলিকাতা,২০১৫, আরণ্যকাণ্ডে, সর্গ-৪৭, শ্লোক১২।

৪। বাল্মীকি রামায়ণম্, অযোধ্যাকাণ্ড, সর্গ-২১, শ্লোক২,৩।

৫। বাল্মীকি রামায়ণম্, অযোধ্যাকাণ্ড, সর্গ-১২, শ্লোক৮০,৮১।

৬। বাল্মীকি রামায়ণম্, অযোধ্যাকাণ্ড, সর্গ-১২, শ্লোক৮৩।

৭। বাল্মীকি রামায়ণম্, অযোধ্যাকাণ্ড, সর্গ-২১, শ্লোক১২।

৮। বাল্মীকি রামায়ণম্, আদিকাণ্ডে, সর্গ-৪৮, শ্লোক২০।

৯। বাল্মীকি রামায়ণম্, আদিকাণ্ডে, সর্গ-৪৮, শ্লোক২১।

১০। বাল্মীকি রামায়ণম্, আদিকাণ্ডে, সর্গ-৪৮, শ্লোক২৭।

১১। বাল্মীকি রামায়ণম্, আদিকাণ্ডে, সর্গ-৪৮, শ্লোক৩৯।

১২। বাল্মীকি রামায়ণম্, উত্তরকাণ্ড, সর্গ-২৯, শ্লোক৩২,৩৩।

১৩। বাল্মীকি রামায়ণম্, আরণ্যকাণ্ড, সর্গ-১৭, শ্লোক৯।

১৪। বাল্মীকি রামায়ণম্, আরণ্যকাণ্ড, সর্গ-১৭, শ্লোক২৮।

১৫। বাল্মীকি রামায়ণম্, আরণ্যকাণ্ড, সর্গ-৩৩, শ্লোক২৩।

১৬। বাল্মীকি রামায়ণম্, আরণ্যকাণ্ড, সর্গ-৩৪, শ্লোক২০।

১৭। বাল্মীকি রামায়ণম্, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে, সর্গ-৯, শ্লোক২৬।

১৮। বাল্মীকি রামায়ণম্, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে, সর্গ-১০, শ্লোক২৬।

১৯। বাল্মীকি রামায়ণম্, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে, সর্গ-১০, শ্লোক১৮।

২০। বাল্মীকি রামায়ণম্, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে, সর্গ-১৮, শ্লোক১৮,১৯,২০।

২১। বাল্মীকি রামায়ণম্, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে, সর্গ-১৮, শ্লোক২২।

২২। বাল্মীকি রামায়ণম্, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে, সর্গ-৩২, শ্লোক৩,৪।

২৩। বাল্মীকি রামায়ণম্, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে, সর্গ-৩৩, শ্লোক৩৮।

২৪। বাল্মীকি রামায়ণম্, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে, সর্গ-৩৩, শ্লোক৪৩,৪৪।

২৫। বাল্মীকি রামায়ণম্, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে, সর্গ-৩৩, শ্লোক৫৫।

২৬। বাল্মীকি রামায়ণম্, সুন্দরকাণ্ড, সর্গ-৩৮, শ্লোক২৫।

২৭। বাল্মীকি রামায়ণম্, উত্তরকাণ্ডে, সর্গ-২৯ , শ্লোক১,২।

২৮। বাল্মীকি রামায়ণম্, উত্তরকাণ্ডে, সর্গ-২৯, শ্লোক২০,২১।

২৯। বাল্মীকি রামায়ণম্, উত্তরকাণ্ডে, সর্গ-৩১, শ্লোক৪০,৪১।

৩০। বাল্মীকি রামায়ণম্, উত্তরকাণ্ডে, সর্গ-৩১, শ্লোক৫৪,৫৫,৫৬।

৩১। বাল্মীকি রামায়ণম্, উত্তরকাণ্ডে, সর্গ-১৭, শ্লোক২৪

৩২। বাল্মীকি রামায়ণম্, উত্তরকাণ্ডে, সর্গ-১৭, শ্লোক২৭।

৩৩। বাল্মীকি রামায়ণম্, উত্তরকাণ্ডে, সর্গ-১৭, শ্লোক৩১।

৩৪। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, অধ্যয়-৬, শ্লোক৩৬।

৩৫। বাল্মীকি রামায়ণম্, লঙ্কাকাণ্ডে, সর্গ-১১৩, শ্লোক৭২,৭৩।